Edited with the trial version of
Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

ইউনিট ৬

পরিবারে শিশুর যত্ন

ভূ মিকা

বিশ্বে র সবচেয়ে মূ ল্যবান সম্পদ শিশু। শিশুরাই আগামী দিনের কর্ণধার। বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার অর্ধে ক হলো শিশু। জাতির কর্ণ ধার এই শিশুদের যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার দায়িত্ব পরিবারের।

পু ষ্টিহীনতা বাংলাদেশের একটি গুরু ত্ব পূ র্ণ সমস্যা। এই পু ষ্টিহীনতার অন্যতম শিকার শিশুরা। প্র তিবছর আমাদের দেশে যত লোক মারা যায় তার চার ভাগের তিন ভাগ শিশু এবং তাদের বয়স ৫ বছরের নিচে। যদি শিশুর খাদ্যে তার প্র য়োজনীয় পু ষ্টি সরবরাহ অব্যাহত থাকে তবেই তার দৈহিক ও মানসিক স্বা স্থ্য সু দৃ ঢ় ভিত্তির উপর গড়ে উঠবে। ভবিষ্যৎ জীবনে সে সু স্থ দেহ মনের অধিকারী হয়ে আপন কর্ম দক্ষতার ফলে সমাজ ও দেশের কল্যাণে যথেষ্ট অবদান রাখতে পারবে। জীবনের সূ চনার সময়ের খাদ্য হলেও মানু ষের জীবনের শেষ পর্যন্ত এই শিশু খাদ্যের প্র ভাবে প্র তিফলিত হয়।এক কথায় বলা যায় শিশু খাদ্যের সাথে শিশু র ভবিষ্যৎ জীবন ওৎপ্রো তভাবে জড়িত।

ভালো খাবারের সাথে শিশুর বৃ দ্ধির জন্য ভালো পরিবেশ দরকার। অপরিচ্ছন্ন পরিবেশ শিশুকে রোগাক্রান্ত করে। এই ইউনিটে পরিবারে শিশুর যত্নে র ক্ষেত্রে শিশুর খাদ্য, পোশাক, গোসল, ঘু ম ব্যায়াম ও সূ র্য ালোকের গুরু ত্ব সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

আমাদের দেশে মায়েরাই শিশু পালন করে। শিশু পরিচর্য ায় মায়ের ভূ মিকা অপরিসীম। জন্মের পর শিশুকে সু ষ্ঠু ভাবে গড়ে তোলা মায়েরই দায়িত্ব । তাই শিশুর স্বা স্থ্যরক্ষার তথা আমাদের দেশের ভবিষ্যৎ নাগরিকদের গড়ে তু লতে মায়ের ভূ মিকা অত্যন্ত গুরু ত্ব পূ র্ণ । এদেশের প্র তিটি মায়ের শিশুর পু ষ্টি সম্পর্কে ও শিশুর পরিচর্য া সম্পর্কে জ্ঞান থাকা বিশেষভাবে প্র য়োজন। শিশুকে যত্নে র মাধ্যমে অনু সন্ধিৎসু করে তোলা এবং শিশুর মানসিক বিকাশ ঘটাতে সাহায্য করা মায়ের একটি বিশেষ কাজ।

পরিবারে শিশুর যত্ন সম্পর্কে ধারণা অর্জ ন করতে পারলে আপনি শিশুর যত্ন নিতে পারবেন যত্নে র গুরু ত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন, অন্যদেরকে আগ্র হী করে তু লতে পারবেন।

এই ইউনিটের বিষয়বস্তু কে ৩টি পাঠে ভাগ করা হয়েছে

- পাঠ-৬.১ : নবজাত শিশুর যত্ন
- পাঠ-৬.২ : প্র থম শৈশবে শিশুর যত্ন ; শিশুর খাদ্য, দু ধ ছাড়ানো ও পরিপূ রক খাবার

- **পাঠ-৬.৩ : প্রথম শৈশবে শিশুর যত্ন; শিশুর পোশাক, গোসল, ঘুম, ব্যায়াম ও সূর্যালোক**

পাঠ ৬.১

নবজাত শিশুর যত্ন

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- সদ্য ভূমিষ্ঠ শিশুর খাপ খাওয়ানোর ক্ষেত্রগুলো বর্ণনা করতে পারবেন।
- নবজাত শিশুর মৌলিক চাহিদাগুলো ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- নবজাত শিশুর যত্নের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- নবজাত শিশুর পরিচর্যা করতে পারবেন।
- শিশুর খাদ্য, ঘুম, পোশাক ও নানাবিধ পরিচর্যা সম্পর্কে অন্যকে বলতে পারবেন।

ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর থেকে দুই সপ্তাহ পর্যন্ত সময়কে নবজাতককাল বলা হয়। এসময় শিশুর ওজন কমতে থাকে এবং দুই সপ্তাহের পর জন্মকালীন ওজন ফিরে পায়। কারণ শিশুর শরীরের বাইরের তরল পদার্থ শুকিয়ে যায় এবং নতুন পরিবেশে এসে শিশু নিজেকে খাপ খাওয়াতে সময় নেয়। ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর পরই শিশুকে কতকগুলো ক্ষেত্রে খাপ খাওয়াতে হয়। যেমন, শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়া, পরিবর্তিত তাপমাত্রা, চোষা ও গেলা এবং মলমূত্র নিঃসরণ। নবজাত শিশু বড়ই দুর্বল ও অসহায় এবং অন্যের উপর নির্ভরশীল। শিশু তার প্রয়োজনের কথা বলতে পারে না এবং অসুস্থ হলে বুঝতে পারে না। শিশুদের মৌলিক চাহিদা পূরণ না হলে এবং বিশেষ যত্ন না পেলে শিশু সুস্থ ও সবল দেহ নিয়ে বেড়ে উঠতে পারে না। জন্মের পর পরই শিশুর শরীরের রং, শ্বাসের গতি, দেহের তাপমাত্রা ও নাভির দিকে খেয়াল রাখতে হবে।

দীর্ঘ নয় মাস মায়ের গর্ভে থাকাকালীন সময়ে স্বাভাবিক ভাবেই মায়ের গর্ভনালীর মাধ্যমে শিশু অক্সিজেন গ্রহণ করে। ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর পরই শিশুর নতুন জীবন শুরু হয়। দুই থেকে তিন মিনিটের মধ্যে শিশু কেঁদে উঠে। কান্নার মধ্য দিয়ে সে আসে পাশের সবাইকে জানিয়ে দেয় যে সে পৃথিবীতে এসেছে।এই কান্নার সাথে সাথে তার মাতৃগর্ভে তৈরি হয়ে থাকা নিষ্ক্রিয় ফুসফুসটি বাতাসের সংস্পর্শে এসে সক্রিয় হয়ে উঠে। শিশু না কাঁদলে ফুসফুসে বাতাস প্রবেশ করে না। ফলে শরীরে অক্সিজেনের অভাব হয় এবং গায়ের রং নীলবর্ণ হয়ে যায়। যথাযথ ব্যবস্থা না নিলে মারাত্মক পরিণতি হতে পারে।

শিশুকে অবশ্যই চিকিৎসা কেন্দ্রে নিয়ে যেতে হবে। অন্যথায় শিশুর মুখ ও গুহ্যদ্বারে ক্রমান্বয়ে কুসুম গরম পানির ঝাপটা দিতে হয়। নরম কিছু দিয়ে নাকের ভিতর সুড়সুড়ি দেয়া যায়। শিশুর মুখে মুখ রেখে বারবার ফুঁ দিলেও অনেক সময় শিশু হঠাৎ করে গভীরভাবে শ্বাস নেয়।

ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর শিশুর নিঃশ্বাস প্রশ্বাস নিয়মিত থাকে না। হৃদস্পন্দন হয় ১২০-১৬০ এবং নাড়ির গতি হয় ৭০-৯০ এর মধ্যে।

পরিবর্তিত তাপমাত্রা

মায়ের গর্ভে থাকাকালীন তাপমাত্রা ছিল ১০০০ ফারেনহাইট। ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর কক্ষের তাপমাত্রা ওঠানামা করতে পারে। এই পরিবর্তনশীল তাপমাত্রায় শিশুকে খাপ খাওয়াতে হয়। শিশুকে অধিক ঠান্ডা বা গরমের মধ্যে রাখা উচিত নয়। কোন কোন শিশু তাপমাত্রা সহ্য করতে না পেরে সর্দি, কাশি ও নিউমোনিয়ায় ভোগে। সাধারণত নবজাতকের তাপমাত্রা ৯৭০

ফারেনহাইট থেকে ৯৯.৫০ ফা: পর্যন্ত হয়ে থাকে তবে গরম আবহাওয়াতে ১০০.৩০ ফা: উঠতে পারে। তাপমাত্রার তারতম্যের কারণে শরীরে লালচে গোটা ওঠে। এটাকে বলে মাশিপিসী। এর জন্য ওষুধের প্রয়োজন হয় না, এমনি সেরে যায়।

চোষা ও গেলা

মায়ের গর্ভে শিশু গর্ভনালীর মাধ্যমে পুষ্টি পেতো। এখন তাকে চুষে ও গিলে দৈহিক পুষ্টি লাভ করতে হয়। এতে প্রয়োজন অনুযায়ী শিশু পুষ্টি পায় না। শিশুকে পরিষ্কার করে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মায়ের কোলে এনে দুধ চুষতে দিতে হয়। এতে মায়ের দুধের সরবরাহ দ্রুত হবে। ১৮-২০ ঘন্টা পর্যন্ত মায়ের দুধ পাওয়া না গেলে পরিবর্তিত খাবার দিতে হয়। নবজাতক প্রথম দিন থেকেই খাবার হজম করার জন্য তৈরি থাকে। শিশুর চোষা এবং গেলা একই সাথে চলতে থাকে বলে অনেক সময় খাবার গলায় আটকে যায় এবং বমি করে ফেলে দেয়।

মলমূত্র নিঃসরণ

ভূমিষ্ঠ হওয়ার কিছুক্ষণ পরেই নবজাতকের মলমূত্র নিষ্কাশনকারী অঙ্গগুলো কর্মক্ষম হয়। গর্ভে থাকাকালীন এসব দূষিত পদার্থ গর্ভনালীর মাধ্যমে নিষ্কাশিত হতো। শিশু দিনে প্রায় ৪-৫ বার মলত্যাগ এবং ১৮-১৯ বার প্রস্রাব করে।

নবজাত শিশুর পরিচর্যা

নবজাত শিশুর পরিচর্যা করতে হলে শিশুর কতকগুলো মৌলিক চাহিদা সম্পর্কে জানতে হবে। যেমন, উপযুক্ত খাদ্য, পোশাক, ঘুম, মলমূত্র ত্যাগ , পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ইত্যাদি।

যদি মা সুস্থ থাকেন তবে শিশুর পরিচর্যা তাঁর নিজের হাতেই করা উচিত। এতে শিশুর সাথে মায়ের শারীরিক ও মানসিক একাত্মতা গড়ে ওঠে।

নবজাত শিশুর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম থাকে তাই খুব সাবধানতার সাথে শিশুর পরিচর্যা করতে হবে। ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর পরই নবজাতকের শরীর, মাথা, চুল ভালোভাবে পরিষ্কার করে মায়ের কাছে নিয়ে আসতে হবে। এসময় গোসল অত্যন্ত জরুরি। গোসল করালে ঠান্ডা লাগবে এটা সম্পূর্ণ ভুল ধারণা।

অনেক নবজাত ছেলে শিশুর পুরুষাঙ্গ সম্পূর্ণ চামড়ার আচ্ছাদনে ঢাকা থাকে। এসময় টানা হেচড়া করা উচিত নয়। তিন বছর বয়সের মধ্যেই লিঙ্গমুখ খুলে যায়। মেয়ে শিশুর বেলায় যোনিদ্বার দিয়ে আঠালো সাদা স্রাব বের হয় আবার কখনও রক্তমিশ্রিত থাকে। এর কারণ হচ্ছে শিশুরা মায়ের কাছ থেকে কিছু কিছু গ্রন্থিরস নিয়ে জন্মায়। প্রাকৃতিক নিয়মেই এ রকম হয়ে থাকে।

নাভীর পরিচর্যা

ভূমিষ্ঠ হওয়ার ১০-১৫ মিনিটের মধ্যে নাভীর সাথে সংযুক্ত গর্ভনালী কেটে দেয়া হয়। নাভীতে ব্যান্ডেজ না লাগানোই ভালো এতে ঘা শুকাতে দেরি হয়। নাভী শুকাতে ৭-১০ দিন সময় লাগে। নাভীর চারপাশে জেলির মতো এক প্রকার আঠালো পদার্থ থাকে সেজন্য চারপাশ ভেজা থাকে। এতে সহজেই জীবাণু সংক্রমণ হতে পারে। ঠিকমত যত্ন না নিলে নাভীতে প্রদাহ, টিটেনাস এবং অন্যান্য সমস্যা হতে পারে। প্রত্যেক দিন স্পিরিট দিয়ে নাভী পরিষ্কার করতে হবে। সম্পূর্ণভাবে শুকোনোর আগে না ভেজানোই ভালো। এতে নাভীতে পুঁজ জমতে পারে। অনেক সময় নাভী কাটার পর পর রক্তপাত হয়। তখন চিকিৎসকের কাছে যেতে হবে।

নবজাতকের খাদ্য

অতীতে শিশুকে জন্মের পর গ্লুকোজের পানি, মধু কিংবা পরিষ্কার পানি মুখে দেয়া হতো। বর্তমানে চিকিৎসকের বিশ্বাস হলো যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এমনকি প্রসব কক্ষেই শিশুকে মায়ের

দুধ দিতে হবে। তিন/চার ঘন্টার মধ্যে শিশুকে মায়ের প্রথম শাল দুধ দিতে হবে। শাল দুধের রং হলুদ ও আঠালো হয় এবং প্রায় দশ দিন পর্যন্ত দুধের রং এমন থাকে। শাল দুধে রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা থাকে। এই দুধে শিশুর পুষ্টিরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় সব খাদ্য উপাদানই উপযুক্ত পরিমাণে রয়েছে। সেজন্য অন্য কোন খাবারের প্রয়োজন নেই, এমন কী পানিও পান করাতে হয় না। মনে রাখতে হবে দুধ খাওয়ানোর আগে মায়ের স্তনের বোঁটা এবং চারপাশ গরম পানিতে তুলা ভিজিয়ে ভালো করে ধুয়ে পরিষ্কার করতে হয়। শিশুকে কোলে নিয়ে দুধ খাওয়াতে হবে। মা কখনও শুয়ে শিশুকে দুধ পান করাবেন না কারণ দুধের চাপে শিশুর নাক বন্ধ ও নাকে মুখে দুধ প্রবেশ করতে পারে। শিশুরা পাঁচ থেকে দশ মিনিট দুধ খাওয়ার পর তৃপ্ত হয়ে আপনা থেকেই ছেড়ে দেয় এবং ঘুমিয়ে পড়ে। তা হলে ধরে নিতে হবে যে ৮০ থেকে ৯০ ভাগ দুধ ইতিমধ্যেই শিশু খেয়েছে।

চিত্র ৬.১ ঃ মায়ের দুধই নবজাতকের খাদ্য

ত্বকের যত্ন

যতদিন পর্যন্ত নাভী না শুকায় ততদিন পর্যন্ত অলিভ অয়েল বা বেবি অয়েল দিয়ে ত্বক পরিষ্কার করতে হবে। ভূমিষ্ঠ হওয়ার ২৪ ঘন্টার ভিতর শিশু প্রস্রাব করে। মল অনেকটা সুবজ ও কালচে রং এর হয়। মল হয় তরল, আঠালো এবং ঘন। দুই তিন দিন পর আস্তে আস্তে রং এর পরিবর্তন হয়। শিশুর ত্বক নরম সেজন্য যতবার প্রস্রাব পায়খানা করে ততবারই কাপড় বদলাতে হবে। ডলাডলি না করে তুলাতে তেল মেখে মুছে দিতে হবে। শীতকালে তেল এবং গরমের দিনে পাউডার ব্যবহার করা উচিত। অনেক সময় শিশুর শরীরে লালচে ঘামাচির মতো হয় তখন তেল ব্যবহার করা সম্পূর্ণ নিষেধ।

চোখের যত্ন

ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর কয়েকদিন কুসুম গরম পানিতে তুলা ভিজিয়ে অথবা সুতি কাপড় ভিজিয়ে চিপে মুছতে হবে। চোখে পিঁচুটি দেখা গেলে একবার চোখে মোছা তুলা দিয়ে অন্য চোখ মোছা উচিত নয়।

কানের পরিচর্যা

গোসল করানোর সময় কানে যাতে পানি না যায় সেজন্য কানে তুলা গুজে নিতে হবে। পরিষ্কার পাতলা কাপড় দিয়ে খুব সাবধানে কানের বাইরে পরিষ্কার করা উচিত। কানে কোনভাবেই তেল বা ক্রিম দেয়া ঠিক নয়।

শিশুর ঘুম

ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর দিনে রাতে শিশু ২০ ঘন্টা ঘুমায়। দুধ খেতে খেতে শিশু ঘুমিয়ে যায়। ঘুমিয়ে গেলে জাগিয়ে খাওয়ানোর প্রয়োজন নেই। শিশুর বিছানা হবে নরম ও আরামদায়ক। শিশুর মাথার ও ঘাড়ের হাড় নরম থাকে সেজন্য শিশুকে বালিশের পরিবর্তে শাড়ি পেঁচিয়ে টুপির মতো করে মাথার নিচে চেপে ঘুম পাড়াতে হয়। এতে শিশু নিরাপদ অনুভব করে। নইলে ঘুমের মধ্যে বার বার কেঁপে ওঠে, মশা, মাছির হাত থেকে রক্ষার জন্য দিনের বেলায়ও ছোট মশারির নিচে শিশু ঘুমাবে। পরিবেশ হবে কোলাহলমুক্ত, স্বাস্থ্যসম্মত, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, নিরাপদ ও শান্ড়।

শিশুর গোসল

প্রত্যেক দিন নির্দিষ্ট সময়ে শিশুকে গোসল দিলে শিশু শারীরিকভাবে সুস্থ থাকে, ভালোভাবে ঘুমাতে পারে এবং খাবারে রুচি আসে। তবে দুপুর ১২ টার পর গোসল করানো উচিত নয়।

গোসল করানোর নিয়ম:

- প্রত্যেক দিন নির্দিষ্ট সময়ে সকাল ১০-১১ টার মধ্যে গোসল সম্পন্ন করতে হবে।
- খোলামেলা জায়গায় গোসল দিলে ঠান্ডা লেগে যেতে পারে। ঘরের ভিতর দরজা জানালা বন্ধ করে কোন এক জায়গায় গোসল দিতে হবে।
- গোসলের পানি হবে কুসুম গরম।
- শিশুর কানে যাতে পানি না যায় এবং নাভীতে যেন পানি না লাগে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

প্রথম দিকে মা শিশুকে কোলে রবার ক্লথ বিছিয়ে গোসল করাতে পারেন। হাতের ঘড়ি, আংটি খুলে রেখে সাবান দিয়ে ভালো করে হাত ধুয়ে নিতে হবে। গামলায় কুসুম গরম পানি এবং গোসলের সব সরঞ্জাম হাতের কাছে রাখতে হবে।

গোসলের আগে নরম তোয়ালে অথবা নরম কাপড়ের কোণা ভিজিয়ে অথবা তুলা দিয়ে শিশুর নাক ও কান পরিষ্কার করতে হবে। দুকানে তুলা দিলে পানি ঢোকার সম্ভাবনা থাকে না। গায়ে পানি দেয়ার আগে নরম তোয়ালে অথবা স্পঞ্জে সাবান মেখে তা দিয়ে শিশুর সারা শরীরে ভালোভাবে মাখতে হবে। গলার ভাঁজ ও হাঁটুর ভাঁজের ময়লা পরিষ্কার করতে হবে নইলে ঘা হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এবার হাতে পানি নিয়ে শিশুর মাথা মোছার মতো করে ধুয়ে দিতে হবে। তারপর গায়ে পানি দিয়ে সাবান ধুয়ে কোলে শুক্‌নো তোয়ালে দিয়ে শরীরের সমস্ত পানি মুছে নিতে হবে। গোসলের আগে তেল মাখালে গোসলের পর শিশুর শরীর ভালো করে মুছতে হয়, নইলে ঠান্ডা লেগে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। গরমের দিনে আলতো ভাবে শিশুর গায়ে পাউডার দিলে শিশু স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে।

চিত্র ৬.২ ঃ শিশুকে গোসল করানো

শিশুর পোশাক

নবজাত শিশুকে পুরানো সুতি কাপড় দিয়ে পেঁচিয়ে রাখাই সুবিধাজনক। সেলাই করা জামা পরাতে ও খুলতে অসুবিধা হয়। সেজন্য নরম কাপড়ের টুকরো দিয়ে গলা ও বগলের জন্য সামান্য কেটে বুক খোলা অবস্থায় ফিতা আটা জামা পরাতে হবে। বোতামের পরিবর্তে কাঁধে ফিতা লাগানো ভালো। কেনা পোশাক আকর্ষণীয় বটে কিন্তু তার শক্ত কুচি, ফিতে ও বোতাম শিশুর পক্ষে কষ্টকর। শীতের দিনে উল বা ফ্লানেলের পোশাক সামনের দিকে খোলা রেখে ফিতা বাঁধতে হবে। মাথা দিয়ে খোলা হয় তেমন পোশাক পরানো উচিত নয়। শীতকালে ফ্লানেল বা উলের বোনা টুপি দিয়ে মাথা ঢাকতে হবে এবং উলের বোনা মোজা পরাতে হবে।

পোশাক যা-ই হোক। ছোট শিশু প্রচুর ঘামে তাই একটু পর পর শিশুর ঘাম মুছে দিতে হবে নইলে ঠান্ডা লেগে যাবে। শিশুর কাপড় বার বার ধুতে হয় সেজন্য এমন কাপড় বাছাই করতে হবে যাতে নষ্ট না হয়, সহজে ধোয়া যায় এবং রং পাকা হয়।

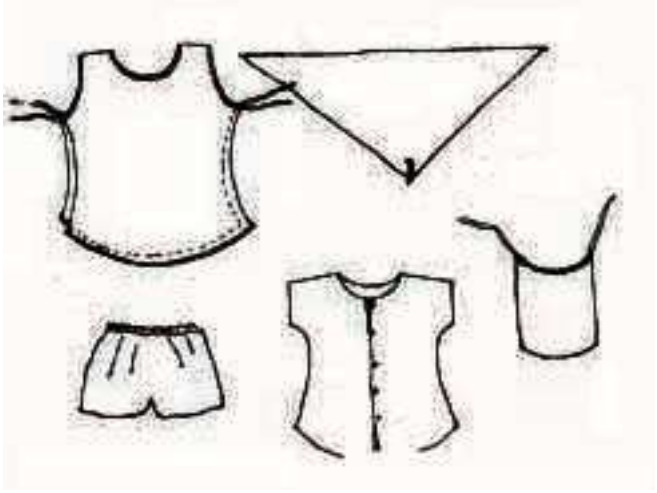

চিত্র ৬.৩ ঃ শিশুর পোশাক

শিশুর ন্যাপি

নরম পাতলা কাপড় তিনকোনা করে কেটে ন্যাপি বানানো হয়। শিশুর ন্যাপি ভিজে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বদলে দিন। সাবান দিয়ে ধুয়ে রোদে শুকিয়ে নেয়া ভালো। রোদ না থাকলে কাপড় শুকানোর পর ইস্ত্রি করে নিলে ন্যাপি জীবাণুমুক্ত হবে। শিশুদের সবসময় ন্যাপি না পরিয়ে মাঝে মাঝে ন্যাপি ছাড়া রাখা উচিত নইলে এতে র‍্যাশ হতে পারে।

শিশুর ঘরের পরিবেশ

শিশুর কক্ষ আলো বাতাসপূর্ণ হবে। আমাদের দেশে আঁতুর ঘর ছিদ্রমুক্ত রাখা হয়। ঘরের দরজা জানালা বন্ধ রাখলে শিশুর দেহের তাপ বাড়ে। তবে খোলা জানালা বা দরজা থেকে শিশুকে দূরে রাখতে হবে। সরাসরি ফ্যানের বাতাস যেন শিশুর গায়ে না লাগে। প্রয়োজনে মশারীর উপর কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখা যায় যাতে সরাসরি বাতাস গায়ে না লাগে। স্যাঁতসেঁতে অন্ধকার ঘরে শিশুকে রাখা উচিত নয় এবং শিশুর বিছানার পাশে ভেজা কাঁথা, চাদর শুকাতে দেয়া উচিত নয়। আবার আর্দ্রতা বেশি কমে গেলে শিশুর নাক শুকিয়ে যায়। বিছানার চারপাশ যথাসম্ভব পরিষ্কার এবং গোছানো থাকতে হবে। জানালা খোলা রেখে পর্দা টেনে দিলে প্রাকৃতিক বাতাস সরাসরি শিশুর গায়ে লাগবেনা। শিশুর কক্ষ হবে কোলাহলমুক্ত। শিশুকে পিঠাপিঠি ভাইবোনদের কাছ থেকে দূরে রাখতে হবে কারণ অনেক সময় অতিরিক্ত আদর শিশুর জন্য মারাত্মক হতে পারে।

পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা

শিশুর সুস্বাস্থ্যের জন্য পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার দিকে নজর দিতে হয়। গ্রামে এখনও সাতদিন পর্যন্ত আঁতুড় ঘরে বাইরের লোকদের ঢুকতে দেয়া হয় না। মনে রাখতে হবে:

- অপরিষ্কার হাতে শিশুকে ধরা উচিত নয়।
- শিশুর সাবান, তোয়ালে, পাউডার, তেল তার নিজস্ব থাকবে।
- বাইরের লোকদের কোলে শিশুকে যত কম দেয়া যায় ততই ভালো।
- বাইরে থেকে ফিরে এসে কাপড়-চোপড় না খুলে শিশুকে আদর করা, দুধ খাওয়ানো, কোলে নেয়া উচিত নয়।
- সময়মত টীকা ও ইনজেকশন দিতে হবে।

সারাংশ

ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর শিশুকে কতকগুলো ক্ষেত্রে খাপ খাওয়াতে হয়। শিশুর পরিচর্যা করতে মৌলিক চাহিদার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। এতে শিশু সুস্থ ও সবল দেহ নিয়ে বেড়ে উঠবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ৬.১

সঠিক উত্তরের পাশে (√)টিক চিহ্ন দিন।

১. নবজাতকের কান্নার কারণ কী?
(ক) নতুন পরিবেশে অভিযোজনের জন্য।

(খ) ফুসফুসের কার্যক্রম শুরু হয় বলে।
(গ) অক্সিজেনের অভাবের জন্য।

২. নবজাতকের শরীরের স্বাভাবিক তাপমাত্রা কত?
(ক) ৯৪-৯৬০ ফারেনহাইট (খ) ৯৭-৯৯.৫০ ফারেনহাইট
(গ) ১৩০-১০৬০ ফারেনহাইট

৩. ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর কখন নাভী কাটা হয়?
(ক) ১ থেকে ৫ মিনিটের মধ্যে নাভী কাটা হয়।
(খ) ১০ থেকে ১৫ মিনিটের মধ্যে নাভী কাটা হয়।
(গ) ১ ঘন্টা থেকে ২ ঘন্টার মধ্যে নাভী কাটা হয়।

৪. মায়ের শালদুধে কী থাকে?
(ক) মধুর মতো মিষ্টি থাকে। (খ) চর্বি বেশি থাকে।
(গ) রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা থাকে।

সঠিক উত্তর মিলিয়ে নিন

(১) শালদুধের রং	(ক) হলুদ ও আঠালো
(২) নবজাতকের মল হয়	(খ) হলুদ ও আঠালো
(৩) শিশুর সাজ সরঞ্জাম	(গ) আরামদায়ক
(৪) শিশুর পোশাক হবে	(ঘ) তার নিজস্ব থাকবে

শূন্যস্থান পূরণ করুন

(ক) নাভী শুকাতে – থেকে – দিন সময় লাগে।
(খ) ভূমিষ্ঠ হওয়ার – মধ্যে শিশু প্রস্রাব করে।
(গ) নরম পাতলা কাপড় – কেটে – বানাতে হয়।
(ঘ) কুসুম – পানিতে – ভিজিয়ে চোখ মুছতে হয়।
(ঙ) রোজ সকাল – টার মধ্যে শিশুর গোসল দিতে হবে।
(চ) কানে যাতে – না যায় সেজন্য কানে – গুজে দিতে হবে।
(ছ) শিশুর কক্ষ হবে – এবং –

রচনামূলক প্রশ্ন

১. সদ্য ভূমিষ্ঠ শিশুর কোন কোন ক্ষেত্রে খাপ খাওয়াতে হয়? আলোচনা করুন।
২. শিশুর যত্নের প্রয়োজনীয়তা কী? নবজাত শিশুর যত্ন সম্পর্কে বর্ণনা দিন।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

(ক) নবজাতক শিশুর মৌলিক চাহিদাগুলো কী?
(খ) নবজাত শিশুর খাদ্য কেমন হওয়া উচিত?
(গ) শিশুকে গোসল দেয়ার নিয়ম কী?
(ঘ) শিশুর পোশাক বলতে কী বোঝায়?

উত্তরমালা ঃ

১। খ ২। খ ৩। খ ৪। গ

সঠিক উত্তর মিলিয়ে নিন ঃ ১। খ ২। ক ৩। ঘ ৪। গ

শূন্যস্থান পূরণ ঃ

(ক) ৭, ১০ (খ) ১৪ ঘন্টার (গ) তিনকোনা করে, ন্যাপি

(ঘ) গরম, তুলা (ঙ) ১১ (চ) পানি, তুলা

(ছ) আলো বাতাসপূর্ণ, কোলাহলমুক্ত।

পাঠ ৬.২

প্রথম শৈশবে শিশুর যত্ন শিশুর খাদ্য, দুধ ছাড়ানো ও পরিপূরক খাবার

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- প্রথম শৈশবের সময়সীমা বর্ণনা করতে পারবেন।
- শিশু পরিচর্যায় খাদ্যের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- মাতৃদুগ্ধের গুণাগুণ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- দুধ ছাড়ানো ও পরিপূরক খাবার সম্বন্ধে বর্ণনা করতে পারবেন।
- পরিপূরক খাবারের গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবেন।

প্রথম শৈশবের বয়সসীমা হলো দুই সপ্তাহ থেকে আড়াই বছর। তার পর শুরু হয় প্রাক স্কুলগামী বয়স। একটি স্বাভাবিক শিশুর ছয় মাস বয়সে ওজন হয় জন্মকালীন ওজনের দুইগুণ; এক বছরে তিনগুণ এবং দুই বছরে চারগুণ। এই দ্রুত বৃদ্ধির সময় শিশুর সঠিক পরিচর্যা প্রয়োজন।

পরিবারে শিশুর যত্নের প্রথম এবং প্রধান উপাদান হলো খাদ্য। যেহেতু মগজের বৃদ্ধি আড়াই বছর বয়সে বন্ধ হয়ে যায় সেহেতু শৈশবকাল মানুষের জীবনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সময়। পুষ্টিহীনতা বাংলাদেশের একটি গুরুতর সমস্যা। পুষ্টিহীন শিশুর মস্তিষ্ক ঠিকমত বাড়ে না এবং তাদের বুদ্ধিও ঠিকমত বিকাশ লাভ করতে পারেনা। এরা প্রায়ই অসুস্থ থাকে। ফলে পড়াশুনায় মন বসে না এবং তাদের স্মরণশক্তি কমে যায়। বড় হওয়ার পর এধরনের লোকেরা কোন বুদ্ধিবৃত্তির কাজ করতে পারে না। জন্মের পর থেকে ৪ মাস বয়স পর্যন্ত শিশুর উৎকৃষ্ট খাদ্য হলো মায়ের দুধ। বয়স বাড়ার সাথে সাথে খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা বেড়ে যায় ফলে মায়ের দুধের পাশাপাশি পরিপূরক খাবার দিতে হয়।

শিশুর খাদ্য

শিশুর খাদ্যের চাহিদা পূরণ না হলে তার বিকাশ প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত হয়। শিশুর শারীরিক বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন উপযুক্ত খাদ্য। শিশুর জন্মের পর মায়ের দুধই প্রধান ও সর্বোত্তম খাদ্য। মায়ের দুধের উপাদানগুলো শিশুর জন্য পুরোপুরি উপযুক্ত। শিশুকে প্রথম ছয়মাস বয়স পর্যন্ত শুধুমাত্র মায়ের দুধ খাওয়ালে শিশুর সুষ্ঠু ও স্বাভাবিক শারীরিক ও মানসিক বিকাশ ঘটে। ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর থেকে ৪ মাস পর্যন্ত শিশুকে মায়ের দুধের উপরই নির্ভর করতে হয়। বুকের দুধ ছাড়া অন্য কোন খাবার খাওয়ালে শিশুর স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও বিকাশ ব্যাহত হয়।

মায়ের দুধের গুণাগুণ

১. মায়ের শালদুধ বা কোলেস্ট্রাম শিশুর জীবনে টীকা হিসেবে কাজ করে। দুধে যে এ্যান্টিবডি থাকে তা শিশুকে জীবাণুঘটিত রোগের হাত থেকে রক্ষা করে। শিশুর জীবনের কয়েক মাস নানাবিধ রোগের কবলমুক্ত রাখতে সাহায্য করে। এতে ডায়রিয়া, কোষ্ঠকাঠিন্য, শ্বাসতন্ত্রের সাধারণ রোগ ও অন্যান্য রোগ প্রতিরোধ করে।

২. মায়ের দুধ শিশুর জন্য পুষ্টি উপাদানসমৃদ্ধ সুষম খাদ্য। মায়ের দুধে রোগ জীবাণু প্রবেশের ভয় থাকে না।

৩. শুধুমাত্র মায়ের দুধই শিশুর প্রথম ৪ মাস বয়স পর্যন্ত সকল প্রকার পুষ্টি জোগায়। পরবর্তী সময়ে তার শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য বিকাশে সহায়ক হয়। শিশুর প্রয়োজনীয় সব খাদ্য উপাদান থাকে বলে এটি আদর্শ খাদ্য এবং এর কার্যকারিতা শিশুর জন্য শতকরা ১০০ ভাগ। মায়ের দুধে ভিটামিন সি পাওয়া যায় যা অন্য কোন দুধে পাওয়া যায় না।

৪. মায়ের দুধে এলার্জি হয় না। শিশু বেশি সময় ধরে ঘুমায়।

৫. বোতলের দুধ পানকারী শিশু কম স্বাস্থ্যবান হয়। মায়ের দুধ শরীরের তাপমাত্রা অনুযায়ী থাকে বলে গরম বা ঠান্ডা করতে হয় না। বাসি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। মায়ের পরিশ্রম কম হয়। বেড়াতে গেলে শিশুর খাবারের বোঝা টানতে হয় না।

৬. শিশুর প্রয়োজন অনুসারে মায়ের দুধের গুণগত পরিবর্তন হয়। শিশু যত বড় হতে থাকে তার শরীর ও মনের পরিবর্তন ও চাহিদা অনুযায়ী মায়ের দুধের রূপান্তর ঘটে, যেমন সকালে এক রকম ও বিকালে অন্য রকম।

৭. মায়ের দুধে মা ও শিশু দুজনেরই মানসিক তৃপ্তি ঘটে।

শিশুদের কৃত্রিম খাবার

বিভিন্ন কারণে বিশেষ করে মায়ের অসুস্থতা, মাতৃস্তনে অপর্যাপ্ত দুধ, মায়ের অত্যাধিক স্তনস্ফীতি বা স্তনে ঘা, কর্মজীবী মায়ের কর্মব্যস্ততার কারণে মায়ের দুধের পরিবর্তে গরুর দুধ, ছাগলের দুধ বা টিনজাত দুধ খাওয়ানো হয়। কৃত্রিম শিশু খাদ্যে শিশুর স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও বিকাশ ব্যাহত হয়। বাইরের দুধ সে গরুরই হোক বা টিনজাত হোক নানা প্রকার সংক্রামক রোগের জীবাণু

বহন করার সম্ভাবনা থেকে মুক্ত নয়। বিশেষ করে পরিবেশন পদ্ধতির আনুষঙ্গিক অবস্থা যদি ত্রুটিযুক্ত হয়। গরুর দুধে চর্বির পরিমাণ বেশি হওয়াতে হজমের গন্ডগোল হয়।

প্রতি কেজি গরুর দুধ ও মায়ের দুধের খাদ্য উপাদান

দুধ	আমিষ	আমিষের কার্যক্ষমতা	শর্করা	তেল	শক্তি
মায়ের দুধ	৩৫গ্রাম	১০০ শতাংশ	৮২গ্রাম	৭০গ্রাম	৬৭৬ ক্যালরি
গরুর দুধ	৭০গ্রাম	৭৫ শতাংশ	৭০গ্রাম	৭০গ্রাম	৫৯০ ক্যালরি

কৃত্রিম দুধ খাওয়ানোর সরঞ্জামঃ

ঢাকনিসহ বোতল রাখার গামলা ১ টি, বোতল ধোয়ার গামলা ১টি, গরম পানি করার সসপ্যান ২ টি, বোতল ৫-৬টি, নিপল ৬টি, দুধ মাপার কাপ ১টি, চিনি ১ বোতল।

আজকাল বাজারে কাঁচের এবং প্লাষ্টিকের দুধের বোতল পাওয়া যায়। সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে ব্রাশে সাবান লাগিয়ে বোতলগুলো ধুয়ে ৫-১০ মিনিট গরম পানিতে ফুটিয়ে নিতে হবে। নিপল ১ মিনিট ফুটালেই যথেষ্ট। নিপলের ফুটো এমন হবে যাতে দুধ বেশি না পড়ে। টিনের দুধ বানানোর নিয়ম হলো-দুধ মাপার কাপে পাউডার দুধ নিয়ে ফুটন্ত পানি দিয়ে পেস্ট তৈরি করে বাকি পানি মিলিয়ে ছেঁকে নিতে হয়।

গরুর দুধের বেলায় ৩ মাসের আগে পানি মিশিয়ে জ্বাল দিতে হয়। ৩ মাসের পর আর পানি মেশানো উচিত নয়। দুধ ফুটাবার আগে চিনি মিশিয়ে নেবেন। মায়ের দুধ টানার চেয়ে বোতলের দুধ টানতে সহজ বলে অনেক শিশু বোতলের দুধ খেতে পছন্দ করে। প্রতি কিলোগ্রাম শারীরিক ওজনের জন্য ০.৫ আউন্স করে একটি শিশুকে দিনে মোট ৫ বার খাওয়ানো প্রয়োজন। প্রতিবারেই নতুন করে খাবার তৈরি করতে হবে।

গরুর দুধের খাদ্য উপাদানের বেলায় আমিষের পরিমাণ বেশি থাকলেও তার সবটুকু কাজে আসে না। শিশুর বৃদ্ধির জন্য আমিষ ও শক্তি দুটোর দরকার হলেও গরুর দুধ হজম করা কষ্ট। গরুর দুধ বার বার জ্বাল দেয়াতে খাদ্যের গুণগত মান নষ্ট হয়। দুধ ফোটাবার ৪/৫ ঘন্টার মধ্যেই দুধ জীবাণুদুষ্ট হতে পারে। গরুর দুধে লৌহ ও ভিটামিন সি সামান্য পরিমাণে থাকে। এজন্য ৩/৪ মাস বয়স থেকে শিশুকে ফলের রস খাইয়ে ঐ দুটো উপাদানের অভাব পূরণ করতে হয়। নতুবা শিশুর রক্তসল্পতা, ক্ষুধামান্দ্য, খিটখিটে মেজাজ হয় ও ওজন হ্রাসপায়।

বর্তমানে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন শিশুকে বোতলের পরিবর্তে বাটিতে দুধ নিয়ে চামচ দিয়ে খাওয়ানো উচিত। এতে শিশুর পেটে বাতাস ঢুকবেনা।

দুধের তাপমাত্রা

দেহের তাপমাত্রার মতো হবে। হাতের তালুতে নিয়ে সহ্য করার মতো গরম দেখে নিতে হয়।

দুধের পরিমাণ

অনেক শিশুর চাহিদা বেশি থাকে। সাধারণ হিসেব হলো শিশুর যত মাস বয়স তার সাথে ২ যোগ করে যে সংখ্যা হয় তত আউন্স দুধ প্রতিবারে শিশু খাবে। উদাহরণস্বরূপ, শিশুর বয়স যদি ৪ মাস হয় তা হলে ৬ আউন্স দুধ দিতে হবে।

শিশুর পানি খাওয়ানো

টিনজাত ও গরুর দুধ খেলে শিশুকে পানি খাওয়াতে হয়। শিশুকে ফোটানো পানি ঠান্ডা করে চামচ দিয়ে অথবা বোতলে করে খাওয়াতে হবে। গরমের দিনে শিশুকে ঘন ঘন পানি দিতে হয়। শিশু যদি খেতে না চায় তবে বুঝতে হবে তার পানির চাহিদা নেই।

শিশুর দুধ খাওয়ানোর নিয়ম

অধিকাংশ শিশুই ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর প্রথম দুই থেকে তিনদিন অল্প খেয়েই তৃপ্ত থাকে এবং বেশিরভাগ সময় ঘুমিয়ে কাটায়। ধীরে ধীরে শিশুর চাহিদা বাড়তে থাকে এবং শিশু বার বার খেতে চায়। নির্দিষ্ট সময়ের আগেই যদি শিশু খেতে চায় তখন সময়ের জন্য অপেক্ষা না করে শিশুকে খেতে দিতে হবে। বড় শিশুরা একবারে বেশি পরিমাণে খেতে পারে বলে সহজে ক্ষিদে পায় না। তাই, মধ্যবর্তী সময়ে পানি খাওয়ানো যায়। শিশুকে নিয়ম করে খাওয়ালে হজমক্রিয়া স্বাভাবিক থাকে এবং মা শিশুকে দুধ দেয়ার জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকে। কম ওজনের শিশুদের দুঘন্টা পর পর মায়ের দুধে অভ্যস্ত করাতে হবে। শিশু যদি ঘুমিয়ে থাকে তবে খাওয়ার জন্য না জাগানোই শ্রেয়।

কর্মজীবী মায়েরা অফিসে যাওয়ার সময় বুকের দুধ বাটিতে করে ফ্রিজে রেখে যেতে পারেন। যিনি শিশুর পরিচর্যা করেন তিনি চামচ দিয়ে শিশুকে খাওয়াবেন।

বাতাস বের করা

মায়ের দুধ অথবা বোতলের দুধ খাওয়ানোর সময় শিশুর পেটে বাতাস চলে যায়। ফলে শিশু অস্বস্থি বোধ করে। অনেক সময় শিশু বমি করে দেয়। বাতাস বের করার জন্য শিশুকে খাড়া করে কাঁধের উপর নিয়ে পিঠে আস্তে আস্তে চাপ দিলে শিশু ঢেকুর তোলে এবং আরাম বোধ করে। কমপক্ষে ৩ মাস বয়স পর্যন্ত এ রকম হবে। পরবর্তীতে শিশু নিজেই ঢেকুর তুলতে পারে।

দুধ ছাড়ানো ও পরিপূরক খাবার

শিশুকে দুধ ছাড়ানো কথাটিকে অনেকে ভুল করে মায়ের দুধ বন্ধ করে দেয়া বলে মনে করে। আসলে একটি শিশুকে মায়ের দুধের পাশাপাশি ক্রমে ক্রমে অন্য খাবারে অভ্যস্ত করাকে দুধ ছাড়ানো বলা হয়। ফলে আড়াই বছর বয়সের পর মায়ের দুধ পুরোপুরি ছেড়ে দিয়ে বয়স্কদের খাবার খেতে অভ্যস্ত হয়। অন্যদিকে, বয়স বাড়ার সাথে সাথে দেহের বাড়তি চাহিদা পূরণের জন্য আস্তে আস্তে শিশুকে দুধ ছাড়া খাদ্য উপাদানসমৃদ্ধ অন্য যেসব খাবার খাওয়ানো হয় তাকেই শিশুর পরিপূরক খাবার বলা হয়।

এই পরিপূরক খাবারের জন্য ধীরে ধীরে শিশুর খাদ্যে দুধের পরিমাণ কমে যায়। দুধ ছাড়ানো প্রক্রিয়া দেরি হলে শিশুদের পরবর্তীতে শক্ত খেতে দিলে খেতে চায় না। হঠাৎ করে শক্ত খাবার খেতে পারে না বলে আস্তে আস্তে অভ্যাস করাতে হয়। বাড়ন্ত শরীরের চাহিদা পূরণের জন্য শিশুর পুষ্টির প্রয়োজন তার শরীরের অনুপাতে তার বাবা মায়ের চেয়ে অনেক বেশি।

মায়ের দুধে যে সমস্ত পুষ্টিমান কম রয়েছে এবং বাড়ন্ত শিশুকে পরিপূরক খাবারের মাধ্যমে যা পূরণ করতে হবে:

১. মায়ের দুধে পরিমাণমত ভিটামিন 'এ' এবং 'সি' ও ধাতবলবণ লৌহের অভাব রয়েছে।
২. শরীরের বৃদ্ধি ও অফুরন্ত প্রাণচাঞ্চল্যের জন্য যে অতিরিক্ত শক্তি ও আমিষের প্রয়োজনে তা মায়ের দুধ মেটাতে পারে না।
৩. শিশুকে নতুন খাবারের স্বাদ ও গন্ধ ইত্যাদিতে অভ্যস্ত করাতে হবে যাতে বড়দের খাবার খেতে অসুবিধা না হয়।
৪. অপরিপক্ব শিশুর স্বাভাবিক ওজন ফিরিয়ে আনার জন্য বেশি ক্যালরিযুক্ত খাবার দরকার।
৫. খাদ্যপ্রাণ 'ডি' এবং লৌহের চাহিদা মেটাতে হলে বেশি করে মাছ, মাংস, ডিম দিতে হয়। পাঁচ মাস বয়স থেকে দুধের সঙ্গে সুজি, ময়দা , চালের গুঁড়া, খাদ্যশস্য মিশিয়ে এবং পাকা কলা বা আম চটকিয়ে খাওয়ানো যায়। পাঁচ মাস বয়স থেকে ডিমের কুসুম দুধের সাথে অথবা চালের গুঁড়ার সাথে মিশিয়ে খাওয়ানো হয়। এছাড়া তেল দিয়ে রেঁধে রঙিন শাকসবজি ভাত দিয়ে মাখিয়ে খাওয়ানো যায়।

চিত্র ৬.৪ ঃ শিশুর খাদ্য

শিশুর খাদ্য কেমন হওয়া উচিত

পুষ্টিজ্ঞানের অভাবে এবং আর্থিক দুরাবস্থা হেতু আমাদের দেশে শিশুকে শুধুমাত্র শ্বেতসার এবং শস্য জাতীয় খাবার তৈরি করে খাওয়ানো হয়। শিশুর খাদ্য তালিকা কেবলমাত্র সে সমস্ত খাদ্য থেকে বেছে নিতে হবে যা সহজলভ্য, পরিবারের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে এবং সহজেই তৈরি করা যায়। খাদ্য হতে হবে সঠিক খাদ্যমাণযুক্ত নরম ও যথেষ্ট আমিষ ও ক্যালরিসমৃদ্ধ। এতে প্রয়োজনীয় খাদ্যপ্রাণ এবং ধাতবলবণ বিশেষত খাদ্য প্রাণ 'এ' ও 'সি' ও লৌহ থাকবে। এ ব্যাপারে পরিবারের শিক্ষা, সংস্কৃতি এবং প্রচলিত খাদ্যাভ্যাসকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিতে হবে। শিশুকে অন্যান্য খাবারে অভ্যস্ত করানোর সাথে সাথে বুকের দুধও দিতে হবে।

আমরা প্রায় প্রতিদিনই ডাল, ভাত, শাকসবজি ও মাছ খেয়ে থাকি। শিশুদের খাবার তৈরি আমাদের এই সীমিত খাদ্যতালিকা থেকেই করতে হবে। যেমন চালের সাথে ডাল অথবা প্রাণিজ আমিষ কিংবা ঘন সবুজ শাকসবজির সমন্বয়ে খিচুড়ি করা যায়।

ছয় মাস বয়সের পর ছোট মাছ, খিচুড়ি ইত্যাদি দেয়া যায়। মিশ্র খাদ্য নরম এবং সহজপাচ্য করে তৈরি করতে হবে। বয়স্কদের জন্য তৈরি খাবার থেকে প্রয়োজনীয় অংশ তুলে নিয়ে ভালো করে চটকিয়ে, এমন কী সিদ্ধ মাছ চটকিয়ে শিশুকে খাওয়ানো যায়। ৭-৮ মাস বয়সে শিশুদের তিন বেলাই পরিপূরক খাবার খাওয়ানো যায়। বয়স বাড়ার সাথে সাথে খাওয়ার পরিমাণও বাড়বে। দুই বছরের শিশুকে পুরোপুরি বয়স্কদের সাথে খাওয়ানো যায়।

শিশুকে সবসময় ভালো খাবার দিতে হবে যাতে শিশু অল্প খেয়েও প্রয়োজনীয় উপাদান পেয়ে যায়। বয়স্কদের সাথে সাথে খেলেও শিশুকে আড়াই বছর বয়স পর্যন্ত মায়ের দুধ খাওয়ানো যায়। পরবর্তীতে অন্যান্য খাবারের সাথে আলগা দুধ খাওয়ালে তার পুষ্টির সহায়ক হবে।

বিভিন্ন বয়সে শিশুর পরিপূরক খাদ্যের তালিকা

মায়ের দুধের সাথে প্রত্যেকদিন নিচের খাদ্যগুলো দিতে হবে।

৫-৬ মাস বয়স

সকাল ৭-৮ টায়	:	গরুর দুধের সাথে চালের গুঁড়া ও ডিমের কুসুম
সকাল ১১ টায়	:	ফলের রস
দুপুর ১২ টায়	:	শাকসবজি/আলু/মাছ অথবা মাংস/ডাল সিদ্ধ করে চটকিয়ে ছেঁকে বাটিতে করে খাওয়াতে হবে।
বিকাল ৩ টায়	:	চটকানো পাকা কলা, নরম বিস্কুট।

৬-৭ মাস বয়স

সকালের নাস্তা	:	গরুর দুধে সুজি, ডিম
সকাল ১১ টায়	:	ফলের রস অথবা চটকানো কলা
দুপুর ১২ টায়	:	সবজি, মাংস অথবা মাছ, ডাল চাল সিদ্ধ করে জাউ ভাত
বিকাল ৩ টায়	:	মিষ্টি, দই, পাকা ফল, আপেল পাতলা করে কেটে
রাত ৭-৮ টায়	:	জাউ ভাত (মাংস, সবজি, চাল)

৭-৮ মাস বয়স

নাস্তা	:	রুটি, মাখন, ডিম, সিরিয়াল
১১ টায়	:	ফলের রস
১২ টায়	:	ভাত, সবজি, মাছ বা মাংস বা মাংস ডাল
বিকাল ৩ টায়	:	কলা, বিস্কুট
রাত ৭ টায়	:	ভাত/রুটি, মাছ, দুধ

৯-১২ মাস পর্যন্ত

নাস্তা	:	সুজির হালুয়া, রুটি, ডিম, কলা
১০ টায়	:	ফলের রস, বিস্কুট, গাজর সিদ্ধ
দুপুর ১ টায়	:	খিচুড়ি, মাছ, মাংস, দুধ জাতীয় খাবার
বিকাল ৫ টায়	:	সেমাই, বিস্কুট, সুজি নুডলস
সন্ধ্যা ৭ টায়		ভাত/রুটি, মাংস, ডাল
রাত ১০ টায়	:	দুধ

১ বছর থেকে ২$\frac{১}{২}$ বছর বয়স পর্যন্ত দৈনিক খাবার

ভাত/পিঠা/মুড়ি/চিড়া	:	১২০ গ্রাম
ডাল	:	৬২.৫০ গ্রাম
রুটি/বিস্কুট	:	৬২.৫০ গ্রাম
শাকের নিরামিষ বা ভাজি	:	৬২.৫০ গ্রাম
সবজির নিরামিষ বা ভাজি	:	৩১.২৫ গ্রাম
মিষ্টি আলু	:	৯২.৫০
তেল	:	৪ চা চামচ
মাছ বা মাংস	:	৩১.২৫ গ্রাম
দুধ-ভাত/পায়েস	:	২৫০ গ্রাম দুধের
চিনি বা গুড়	:	১২৫০ গ্রাম
ফল	:	১টি

মাঝে মাঝে ডাল ও চালের খিচুড়ি

শিশুর জন্য কার্যকর খাবারের নির্দেশিকা

শিশুরা খাওয়ার ব্যাপারে অন্যের উপর, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মায়ের উপর নির্ভরশীল। সেজন্য-

(১) খাবারের গুণাগুণের দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

(২) খাবার পরিমাণে কম হলেও বেশি ক্যালরি ও প্রোটিনযুক্ত খাবার হতে হবে।

(৩) পরিপূরক খাবার শিশুর উপযোগী করে তৈরি করা প্রয়োজন। কারণ শক্ত শুক্‌নো ও মসলাদার হলে খেতে অসুবিধা হবে এবং হজম করতেও অসুবিধা হবে।

(৪) খাবার তাজা ও টাট্‌কা হবে নতুবা ঐ খাবার থেকে রোগ জীবাণু সংক্রামিত হয়ে শিশুকে অসুস্থ করে তুলতে পারে।

(৫) পরিপূরক খাবারের প্রতি শিশুর আগ্রহ বাড়ানোর জন্য খাবারকে আকর্ষণীয় করতে হবে। খাবারে বৈচিত্র্য্য থাকতে হবে, নইলে একঘেয়েমির দোষে শিশুর কাছে বিরক্তিকর হয়ে উঠবে।

(৬) বিভিন্ন শিশুর বিভিন্ন ধরনের খাবারের প্রতি ঝোঁক থাকে যেমন, কেউ মিষ্টি পছন্দ করে কেউবা নোন্‌তা।

(৭) খাবার তৈরি করতে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতায় দিকে দৃষ্টি দিতে হবে। শিশুর প্লেট, পেয়ালা, চামচ এবং যিনি খাওয়াবেন তার হাত পরিষ্কার থাকবে।

শিশু খাদ্যের সূচনা

ছোট শিশু একবারে বেশি খেতে পারে না। তাই তাদেরকে বারে বারে অল্প করে খাবার দিতে হবে। বিভিন্ন ধরনের খাবার হলে শিশু ভালোভাবে গ্রহণ করবে এবং একঘেয়ে লাগবে না।

শিশুকে নতুন খাবারে অভ্যস্ত করাতে হলে প্রথমে কোয়াটার চামচ (এক চামচের চার ভাগের এক ভাগ) করে দিতে হবে। তার পর আস্তে আস্তে পরিমাণ বাড়িয়ে দেয়া যেতে পারে ও নতুন খাদ্য তার তালিকায় যোগ করা যেতে পারে। শিশু হয়তো প্রথমে নতুন খাবার খেতে চায় না। অনেক সময় শিশুকে নিজ হাতে খেতে দেয়া হয় না বলে খেতে চায় না। শিশুকে খাবারের ব্যাপারে উৎসাহ দিতে হবে। যেমন-

- যেসব খাদ্য শিশু সহজে নাড়াচাড়া করতে পারে সে সব খাদ্য তাকে দিন।
- শিশুরা সময় তালিকা মেনে চলতে পারে সুতরাং প্রত্যেক দিন একই সময়ে খাবার ও নাশ্তা দিন
- প্রথম দিকে খাবার নরম ও তরল হবে যাতে শিশু সহজে খেতে পারে।
- শিশুকে নিজের হাতে খেতে দিন। প্রথমে অল্প খেতে দিন তার পর একটু পর আবার দিন। যদি মনে হয় কম খাচ্ছে তা হলে দুটো চামচ ব্যবহার করুন। একটি চামচ শিশু নিজের হাতে খাওয়ার জন্য অপরটি দিয়ে আপনি তাকে সাহায্য করুন।
- যদি শিশু প্রত্যেক দিন একই খাবার খেতে চায় তাতে চিন্তার কিছু নেই, তবে পরিমাণমত প্রয়োজনীয় খাদ্য উপাদানের ব্যাপারে সচেতন থাকতে হবে।
- খাবারের সময় প্রথমে শক্ত (Solid) খাবার খাবে নইলে তরল খাবার (পানি জাতীয়) দিয়ে পেট ভরে যাবে।
- অনেক রকম খাবার এক সাথে অভ্যাস করানো যাবে না।
- জুস, তরল কিংবা যেকোন পানীয় নির্দিষ্ট পরিমাণে বেশি খেতে দিবেন না। তার পরিবর্তে দুধ কিংবা সিরিয়েল বা ফর্মূলাযুক্ত খাবার দিন।
- শিশুকে প্রতি ২/৩ ঘন্টা পর পর খেতে দিন অর্থাৎ দিনে তিনবার খাবার এবং ২/৩ বার হালকা কিছু খেতে দিন। জোর করে খাওয়াবেন না।
- বেশি শক্তি পাওয়ার জন্য ঘি, মাখন ও পনির খাওয়ানো যায়।
- পরিবারের সকলের সাথে একসাথে বসে খেতে দিলে শিশুর জন্য খাবারটা আনন্দদায়ক হয়।
- আইসক্রিম, চকলেট, কোক, পেপসি কম খাওয়া ভালো। এসব খাবারে প্রোটিন এবং ক্যালরি কম থাকে।
- শিশুর খাবারের বাটি, চামচ, প্লেট দেখতে আকর্ষণীয় হবে। শিশুর বৃদ্ধি ব্যাহত হওয়ার অন্যতম কারণ হলো- দেরিতে খাদ্য গ্রহণে অভ্যাস, বেশি পাতলা টিনজাত খাবার, সিরিয়ালযুক্ত খাবার, ডায়রিয়া, পাকস্থলীর সংক্রমণ ইত্যাদি।

শিশুর পরিচর্যায় মায়ের ভূমিকা

শিশু পরিচর্যায় মায়ের জ্ঞান থাকা প্রয়োজন যেমন-

১. মায়ের জানা প্রয়োজন যে শিশু ঠিকমত মায়ের দুধ পাচ্ছে কিনা; না পেলে কতটুকু আলগা দুধ বা পরিপূরক দুধ খাওয়াতে হবে এবং শিশুর বয়স বাড়ার সাথে সাথে শিশুর পরিপূরক খাবার কী পরিমাণে রাখতে হবে।

২. খাবার রোগ জীবাণুমুক্ত রাখা, খাবার ও পানি ফুটানোর মতো সহজ বিশুদ্ধকরণ প্রক্রিয়া মাকে জানতে হবে।

৩. শিশুর খাবার সম্বন্ধে জ্ঞান থাকতে হবে। কোন খাদ্যে কী কী উপাদান আছে, কী ভাবে রান্না করলে খাদ্যপ্রাণ বজায় থাকবে, কোন খাদ্য গুরুপাক, কোন খাদ্য লঘুপাক তা জানা থাকবে।

৪. খাবার তৈরি করতে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার দিকে নজর রাখবেন। অনেক সময় মায়ের শরীর নোংড়া থাকলে দুধ খাওয়ানোর সময় শিশুর দেহে রোগ জীবাণু সংক্রামিত হতে পারে।

সারাংশ

ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর মায়ের দুধই শিশুর উৎকৃষ্ট খাদ্য। বয়স বাড়ার সাথে সাথে এই দুধ শিশুর বৃদ্ধির বাড়তি চাহিদা মেটাতে পারে না। তাই ৪ মাস বয়স থেকে শিশুকে মায়ের দুধের পাশাপাশি অন্য খাবারে অভ্যস্ত করাতে হয়। এই বাড়তি চাহিদা মেটানোর জন্য খাদ্য উপাদান সমৃদ্ধ অন্য যেসব খাবার দেয়া হয় তাকেই শিশুর পরিপূরক খাবার বলা হয়। সুন্দর ও স্বাস্থ্যবান শিশু পেতে হলে চাই শিশুর জন্য উপযুক্ত খাদ্য।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ৬.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. প্রথম শৈশবের বয়সসীমা কত?
   (ক) এক বছর থেকে দুই বছর (খ) দুই সপ্তাহ থেকে আড়াই বছর
   (গ) জন্মের পর থেকে এক বছর
২. শৈশবকালে পুষ্টির অভাবে কী হয়?
   (ক) শিশু লম্বা হয় না (খ) শরীরে শক্তি পায় না
   (গ) ঠিকমত বুদ্ধির বিকাশ লাভ হয় না
৩. শাল দুধ বা কলষ্ট্রাম নিচের কোন কাজটি করে?
   (ক) শিশুর পেটের অসুখ বাড়িয়ে দেয় (খ) শিশুর জীবনে টীকা হিসেবে কাজ করে
   (গ) হজমের ব্যাঘাত ঘটে
৪. শিশুকে কৃত্রিম দুধ খাওয়ালে কী হয়?
   (ক) শিশু সুস্থ থাকে (খ) শিশু পুষ্টি উপাদানসমৃদ্ধ সুষম খাদ্য পায়
   (গ) ক্যালরি কম পায়

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

ক. শিশুকে দুধ খাওয়ানোর নিয়ম কী?
খ. শিশুকে পরিপূরক খাবার দিতে হয় কেন?
গ. শিশুর পরিপূরক খাবারের সূচনা কী ভাবে হয়?
ঘ. ১ বছর থেকে আড়াই বছর বয়স পর্যন্ত শিশুর দৈনিক খাবার তালিকা কেমন হওয়া উচিত?
ঙ. শিশুর পরিচর্যায় মায়ের কী ধরনের জ্ঞান থাকা প্রয়োজন?

সঠিক উত্তর মিলিয়ে নিন:

১. মায়ের দুধে শক্তির পরিমাণ	ক. শিশুর পেটে বাতাস চলে যায়
২. টিনজাত দুধ	খ. এক সাথে অভ্যাস করানো যাবে না
৩. দুধ খাওয়ানোর সময়	গ. শিশুর বুদ্ধির বিকাশ ব্যাহত হয়
৪. বিভিন্ন রকম খাবার শিশুকে	ঘ. ৬৭৬ কি.ক্যালরি

শূন্যস্থান পূরণ করুন

দুই সপ্তাহ থেকে – মাস বয়স পর্যন্ত শিশুর উৎকৃষ্ট খাদ্য হলো – দুধ। মায়ের দুধ –। ভূমিষ্ঠ হওয়ার আগে থেকে – তৈরি হয়। গরুর দুধের বেলায় – মাসের আগে পানি মিশিয়ে জ্বাল দিয়ে শিশুকে খাওয়াতে হয়। দুধের তাপমাত্রা হবে – তাপমাত্রার মত। মিশ্রখাদ্য – এবং – প্রাপ্য করে তৈরি করতে হবে। পরিপূরক খাবারের প্রতি আগ্রহ বাড়ানোর জন্য খাবারকে – করতে হবে।

রচনামূলক প্রশ্ন

১. প্রথম শৈশবে খাদ্যের গুরুত্ব আলোচনা করুন। মাতৃদুগ্ধের গুণাগুণ আলোচনা করুন।
২. দুধ ছাড়ানো ও শিশুর পরিপূরক খাবার বলতে কী বুঝায়? পরিপূরক খাবার কেমন হওয়া উচিত আলোচনা করুন।

উত্তরমালা ঃ ১। খ ২। গ ৩। খ ৪। ঘ

সঠিক উত্তর ১। ঘ ২। গ ৩। ক ৪। ঘ

শূন্যস্থান পূরণ করুন

৪, মায়ের দুধ, বিশুদ্ধ, মায়ের দুধ, ৩, দেহের, নরম, সহজ, আকর্ষণীয়

পাঠ ৬.৩

প্রথম শৈশবে শিশুর যত্ন-
শিশুর পোশাক, গোসল, ঘুম, ব্যায়াম ও সূর্যালোক

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- শিশুর উপযোগী পোশাক ও বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবেন।
- গোসলের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- শিশুর জীবনে ঘুমের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- শিশুর জন্য পর্যাপ্ত সূর্যালোক ও বিশুদ্ধ বাতাসের ব্যবস্থা করতে পারবেন।

পরিবারে শিশুর যত্নের অন্যান্য শর্তগুলো হলো শিশুর উপযোগী পোশাক, নিয়মিত গোসল, পর্যাপ্ত ঘুম, প্রয়োজনীয় ব্যায়াম এবং শিশুকে পর্যাপ্ত সূর্যালোক ও বিশুদ্ধ বাতাসের ব্যবস্থা করা। শিশুর পোশাক হবে সুলভ, রুচি সম্মত, সুশ্রী এবং স্বাস্থ্যসম্মত যা সহজে ধোয়া যায় এবং বদলানো যায়। বয়স্কদের মতো শিশুরও নিয়মিত গোসলের প্রয়োজন। কারণ নিয়মিত গোসলে শরীর পরিষ্কার থাকে ও ময়লা দূর হয়। এতে শারীরিক স্বাস্থ্যের সাথে সাথে মানসিক স্বাস্থ্যও ভালো থাকে।

শিশুর দৈহিক প্রয়োজনের মধ্যে ঘুম অন্যতম। ঘুমের মধ্যেই নিহিত আছে দেহ ও মনের পূর্ণ বিশ্রাম। শিশুর সুন্দর দেহ গঠনের জন্য উপযুক্ত ব্যায়ামের প্রয়োজন। শিশুরা প্রায় সারাক্ষণই নড়াচড়া করে এতে শরীরের সব অঙ্গের ব্যায়াম হয় না। সূর্যালোক থেকে শিশুর দেহে ত্বকের নিচে ভিটামিন 'ডি' তৈরি হয় যা শিশুর রিকেট রোগের প্রতিরোধক হিসেবে কাজ করে। শিশুর কক্ষ হবে আলো–বাতাস পূর্ণ, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, নিরাপদ ও শান্ত।

শিশুর পোশাক

শিশুদের মৌলিক চাহিদা খাদ্যের পরেই পোশাকের স্থান। পোশাক পরিধানের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে শরীরকে তাপ ও শীত থেকে রক্ষা করা। আরাম ও নিরাপত্তা দান করা। ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর অনাবৃত দেহকে ঢাকার জন্য বোতামবিহীন নরম পাতলা পোশাকই যথেষ্ট। এসময় পোশাকের বদলে নরম কাপড়, তোয়ালে, কাঁথা অথবা ফ্লানেল কাপড় দিয়ে পেঁচিয়ে রাখা হয়। দুই সপ্তাহের পর থেকে শিশুকে বোতামবিহীন কাঁধে ফিতা দিয়ে বাধা যায় এমন নিমা জাতীয় পোশাক পরানো হয়। ৩ মাসের আগ পর্যন্ত শিশু চিৎ হয়ে শুয়ে থাকে সেজন্য সম্মুখ কাটা জামা পরানো হয়। ৩ মাসের পর শিশু উপুর হতে চেষ্টা করে সেজন্য সামনে কোন বোতাম থাকলে শিশুর কষ্ট হয়। ৬ মাসে শিশু অন্যের সাহায্য ব্যতীত বসতে পারে, ৯ মাসে দাঁড়াতে পারে এবং ১ বছরে হাঁটতে শুরু করে। দেড় বছর বয়স পর্যন্ত ছেলেমেয়েভেদে একই পোশাক পরানো যায়। ২ বছর বয়সে শিশু সমবয়সীদের মতো পোশাক পছন্দ করে এবং আড়াই বছরের শিশু নিজে পোশাক পরতে চায়।

শিশুর পোশাক নির্বাচনে বিবেচ্য বিষয়

১. পোশাকের ডিজাইন

২ সপ্তাহের শিশুর পোশাক হবে সাদাসিধে। হালকা পাতলা জামা, বোতামবর্জিত, কাঁধে ফিতা, বুক খোলা এবং লম্বা যাতে সহজে পরানো যায়। গলা দিয়ে পরানো হয় তেমন জামা পরিহার করা বাঞ্ছনীয়। কোমরে কুচি দেয়া জামা ৬ মাসের আগে পরানো উচিত নয় কারণ শিশুর শরীরের চামড়া পাতলা ফলে কুচির চাপে শিশুর র‍্যাশ হতে পারে। দেড় বছরের শিশু হাঁটতে পারে তখন শিশুকে গেঞ্জি জাতীয় বা কুচি দেয়া জামা পরানো যায়। শিশুরা চঞ্চল থাকে সেজন্য যখন থেকে শিশু দাঁড়াতে চেষ্টা করে তখন থেকে তাকে লম্বা পোশাক না পরানোই ভালো এতে শিশুর পা আটকে যেতে পারে। আড়াই বছরের আগে অধিক ডিজাইনবহুল জামা না পরালেই ভালো কারণ এসময় শিশু নিজে নিজে পোশাক পরতে চায়। পোশাক এমন হবে যাতে শিশু বোতাম লাগাতে পারে এবং খুলতে পারে। জামাতে বেশি বোতাম ও হুক পরিহার করতে হবে।

২. আবহাওয়া

শীতকালে শিশুর পোশাক হবে গরম অথচ নরম পোশাক এমন হবে যাতে একটি পোশাকই মাথা থেকে পা পর্যন্ত ঢাকা যায়। শিশুকে ফ্লানেলের জামা অথবা পাতলা মুড়ি জামা পরিয়ে তার উপর উলের জামা পরানো যায়। ১ বছরের শিশু উলের মোজা, জামা, টুপি, পাজামা পরতে পারে। তবে সব চেয়ে বিবেচ্য বিষয় হলো শিশুরা অল্প গরমেই ঘেমে যায় সেজন্য গরম কাপড় যত কম পরানো যায় ততই ভালো। গরমের দিনে হালকা পাতলা সূতির জামাই ভালো। মনে রাখতে হবে, শিশুদের প্রতিরোধ ক্ষমতা কম সেজন্য খুব তাড়াতাড়ি অসুস্থ হয়ে যায়।

৩. পোশাকের কাপড়

গরমের দিনে শিশুর জন্য হালকা রং এর পাতলা সুতি কাপড়ের পোশাক সুবিধাজনক। সুতি কাপড় তাপ সুপরিবাহী এবং দামে সস্তা। নাইলন ও সিনথেটিকের কাপড় দেখতে সুন্দর কিন্তু শিশুর ত্বকের জন্য ক্ষতিকর। অন্যদিকে তাপ কুপরিবাহী বলে গরম লাগে, এ্যালার্জি হয়, ফুসকুরি হতে পারে। শিশুদের গরম অনুভূতি বেশি বলে শীতকালে ফ্লানেলের কাপড় ভালো হয়। আজকাল বাজারে কাপড়ের জুতো পাওয়া যায়। হাঁটতে শেখার আগ পর্যন্ত এ ধরনের জুতো পরানো হয়। শীতকালে নয় মাস পর্যন্ত এসব জুতার কাপড় হবে ফ্লানেলের। ফ্লানেলের টুপিও ছোট শিশুর জন্য উপযোগী।

৪. আরামদায়ক

ডিজাইনের চেয়ে আরামের দিকে নজর দিতে হবে বেশি। আঁটসাঁট, ডিজাইনবহুল জামা শিশুর হাঁটাচলায় অসুবিধা করে। সেজন্য পোশাক কখনই বেশি লম্বা বা খুব ছোট হবে না। লম্বা পাজামা, জুতাতে শিশু বিরক্তবোধ করে। বেশি বোতাম থাকলে শিশুকে যেমন পরাতে ঝামেলা তেমনি শিশু নিজে লাগাতে যেয়ে ব্যর্থ হয়। সহজে পরা যায় তেমন পোশাকই শিশুর জন্য উপযোগী। অনেক সময়ে ডিজাইনের কারণে পোশাক ভারী হয়ে যায় এ ধরনের ভারী পোশাক পরিহার করতে হবে। এতে শিশুর স্বাভাবিক শারীরিক বৃদ্ধি ও স্বাচ্ছন্দ্য ব্যাহত হয়।

৫. পোশাকের রং

শিশুর পোশাকের ডিজাইনের চেয়ে রং এর প্রতি আকৃষ্ট হয় বেশি। উজ্জ্বল রং শিশুদের পছন্দ। পোশাকের রং যাতে পাকা হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে কারণ প্রাণচঞ্চল শিশুরা খেলাধুলা করে, ছোটরা প্রস্রাব করে নষ্ট করে সেজন্য ঘন ঘন ধুতে হয়।

৬. ধৌতকরণ

সূতি কাপড় সহজে ধোয়া যায় এবং বার বার ধোয়াতে নষ্ট হয় না। অনেক সময় ইস্ত্রি করারও প্রয়োজন হয় না। পোশাকের সেলাই হতে হবে মজবুত ও টেকসই।

৭. টুপি, বিব ও ন্যাপি

শীতকালে ফ্লানেলের টুপি পরালে ঠান্ডা লাগার সম্ভাবনা থাকে না। খাওয়ার সময় জামা যাতে নষ্ট না হয় সেজন্য গলায় বিব লাগানো হয়। এটি ন্যাপকিনের কাজ করে।

শিশুকে নিয়ে বেড়াতে গেলে বাজারের কেনা ন্যাপি ব্যবহার করা যায়। বাড়িতে এসব না পরানোই ভালো। এতে র‍্যাশ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। পাতলা নরম কাপড় দিয়ে ন্যাপি বানিয়ে ৬ মাস বয়স পর্যন্ত পরানো যায়। পরবর্তীতে শিশুরা জাঙ্গিয়া পরতে পারে।

৮. রাতের পোশাক

১ বছর বয়স থেকেই ঘুমানোর আগে শিশুকে ঢিলেঢালা পোশাক পরানোর অভ্যাস করাতে হবে। এতে শিশুর ঘুম ভালো হয় এবং শিশু স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে।

পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা

শিশুর কাপড় চোপড় সবসময় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। স্বভাবতই শিশুরা দৌঁড়াদৌঁড়ি করে, খেলাধুলা করে, গরমের সময় ঘামে, খাওয়ার সময় জামা নষ্ট করে, ছোট শিশু প্রস্রাব, পায়খানা করে; এতে পোশাক নষ্ট হয়। শিশুর পোশাক এমন হবে যাতে তার চাহিদা ও শখ মেটায়। পোশাক হবে সহজলভ্য, সস্তা, সুন্দর, স্বাস্থ্যসম্মত, মজবুত, টেকসই এবং সংখ্যায় বেশি যাতে সহজে ধোয়া ও বদলানো যায়।

শিশুর ব্যবহৃত জামা, তোয়ালে, কাঁথা ইত্যাদি রোজ সাবান দিয়ে ধুয়ে জীবাণুমুক্ত করে রোদে শুকিয়ে নিতে হবে। সম্ভব হলে পানিতে কয়েক ফোঁটা ডেটল মেশানো যায়। অন্যদিকে, গরম পানিতেও সোডা ব্যবহার করা যায়।

শিশুর ন্যাপি ভিজে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বদলে ফেলা দরকার এবং শিশুর ভেজা জায়গায় ভালোভাবে ধুয়ে পাউডার ও লোশন দিতে হয়। যদি বাজারের তৈরি কাগজের ন্যাপি পরানো হয় যা একবার ব্যবহারের পর ফেলে দিতে হয় তা হলে অসুবিধা নেই। কিন্তু ঘরে তৈরি নরম ও পানি শুষে নেয় এমন কাপড়ের ন্যাপি সাবান দিয়ে ধুয়ে সোডিয়াম হাইডোক্লোরাইড মিশ্রণে ১৫ মিঃ ডুবিয়ে রাখতে হয়। তাতে ইনফেকশন হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। তারপর ভালোভাবে ধুইয়ে শুকিয়ে নিতে হবে। রোদ না থাকলে ইস্ত্রি করে নিতে হয় এতে ন্যাপি জীবাণুমুক্ত হবে।

শিশুর গোসল

শিশুর যত্নের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো গোসল। শরীর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা ও ময়লা দূর করার জন্য বড়দের মতো শিশুদের নিয়মিত গোসলের প্রয়োজন। ছোট শিশু প্রস্রাব-পায়খানা করে শরীর নোংড়া করে, গরমে শরীর ঘামে, বয়স বাড়ার সাথে সাথে বাইরে খেলাধুলা করে শরীর অপরিষ্কার করে। নিয়মিত গোসলে শিশুর স্বাস্থ্য ভালো থাকে, শিশু আনন্দিত ও প্রফুল্ল থাকে, আরামবোধ করে। শিশুর শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য ভালো থাকে। গোসল না করলে ধুলাবালির কারণে শরীরের লোমকূপ বন্ধ হয়ে শরীরে ফোসকা পড়ে চর্মরোগ হয়।

গোসলের প্রস্তুতি

গোসল করাতে যেয়ে হঠাৎ করে শিশুর গায়ে পানি ঢালতে হয় না, এতে শিশু ভয় পায়। গোসলের আগে সব সরঞ্জামাদি হাতের কাছে রাখতে হবে যেমন: গামলা দুটি মগ, একটি কুসুম গরম পানি, মসৃণ তোয়ালে দুইটি, তুলা, সাবান, পাউডার ও জামা কাপড়।

ছোট শিশুদের গোসলের আগে সরিষার তেল অথবা অলিভ অয়েল মেখে শিশুকে মানসিকভাবে তৈরি করতে হবে। বয়স বাড়ার সাথে সাথে শিশু গোসলের সময় নিজের জামাকাপড় ও সরঞ্জাম নিজেই গোছাতে থাকে।

চার বছরের শিশু গোসল করার নিয়ম শিখে ফেলে। তবুও শিশুকে একা গোসল করতে দেয়া উচিত নয় কারণ শিশু নিজেকে ভালোভাবে পরিষ্কার করতে পারে না, ভালোভাবে গা মুছতে পারে না। এতে শরীরে ঠান্ডা লেগে যেতে পারে।

শিশু যখন বসতে শেখে তখন গোসল উপভোগ করে, পানি নেড়ে আনন্দ পায়। শীতকালে অনেক সময় পানি ঠান্ডা হলে অথবা চোখে সাবান লাগলে শিশুর মনে গোসল ভীতি জাগে। অনেক সময় গামলায় পিছলে পড়ে নাকে মুখে পানি গেলেও শিশু গোসল করতে ভয় পায়।

গোসল করানোর নিয়ম

তিনমাস বয়স পর্যন্ত শিশুকে মায়ের কোলে রেখেই প্রথমে নরম পাতলা কাপড় ভিজিয়ে চিপে শিশুর চোখ, মুখ, নাক, কান পরিষ্কার করে নেবেন।তুলা ভিজিয়ে শিশুর মলদ্বার, লিঙ্গ, যোনিপথ পরিষ্কার করতে হবে। এবার নরম তোয়ালে সাবান মেখে শিশুর মাথা, কান, ঘাড়ের ভাঁজ, বগল, হাত, হাঁটুর ভাজ, পা, পিঠ ও কুঁচকিতে মাখতে হবে। এবার শিশুকে তোয়ালে বিছানো গামলায় কুসুম গরম পানিতে শিশুকে বসিয়ে এক হাত শিশুর ঘাড়ে রেখে, যাতে পড়ে না যায় এমনিভাবে প্রথমে মাথা ধুয়ে সাবান ও ময়লা পরিষ্কার করে দ্বিতীয় গামলার পরিষ্কার পানি দিয়ে ধুয়ে গা মোছানোর তোয়ালে জড়িয়ে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে নরম তোয়ালে দিয়ে গা মুছতে হবে। খেয়াল রাখতে হবে যাতে কানে পানি না যায় সেজন্য আগে থেকেই কানে তুলা গুজে দেয়া যায়। এবার গায়ে পাউডার মেখে জামা পরিয়ে দিতে হবে।

বয়স বাড়ার সাথে সাথে শিশু নিজেই গোসল উপভোগ করে, নিজে নিজে গোসল করতে চায় এবং এতে স্বাবলম্বী হয়।

শিশুর ঘুম

নবজাত শিশু সারাদিনে ২৪ ঘন্টার মধ্যে ২০ ঘন্টা ঘুমিয়ে কাটায়। বয়স বাড়ায় সাথে সাথে ঘুমের পরিমাণ কমে আসে। শিশু সুস্থভাবে বেড়ে উঠার জন্য ঘুম অত্যন্ত জরুরি। ঘুমের মাধ্যমে শিশু বিশ্রাম নেয়। এতে শরীরের অঙ্গ প্রতঙ্গের বিশ্রাম হয়, শরীরের অবসাদ দূর হয়। ঘুম শরীরকে সতেজ করে এবং শারীরিক বর্ধনে সহায়তা করে।

শিশু যতক্ষণ জেগে থাকে হাত-পা ছোড়ে, খেলাধুলা করে, দৌড়াদৌড়ি করে এতে শরীরের তাপ ক্ষয় হয়। এই ক্ষয় পূরণের জন্য ঘুমের প্রয়োজন।

সুস্থ শিশু প্রথম তিন মাস শুধু ক্ষুধা পেলে জাগে আবার মায়ের দুধ খাওয়ার সাথে সাথে ঘুমিয়ে যায়। কোন কোন শিশু সারাদিন ঘুমায় এবং রাতে জেগে খেলতে চায়। শিশুর চোখে ঘুম আসলে শিশু অস্থির হয়ে কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে যায়।

এক বছরের শিশু ২৪ ঘন্টার মধ্যে প্রায় ১০ ঘন্টা ঘুমায়। এভাবে দুই বছর বয়স পর্যন্ত চলতে থাকে। পরবর্তীতে সমবয়সীদের সাথে খেলাধুলা ও আবিষ্কারের নেশায় মেতে থেকে ঘুমের পরিমাণ কমে যায়।

৬ মাস থেকে ১ বছরের শিশুরা সকালে নাস্তা খাওয়ার পর ১ ঘন্টা করে এবং দুপুরে খাবারের পরে ১-২ ঘন্টা ঘুমায়। ৩ বছরের শিশু সকালে ঘুমাতে চায় না কিন্তু দুপুরে ঘুমানো অব্যাহত থাকে। শিশুর দৈনিক ৮ ঘন্টা ঘুমানোর প্রয়োজন।

নবজাত শিশুকে বালিশের পরিবর্তে কাপড়ের বেঁড়ে ঘুম পড়ানো হয় এতে শিশুর মাথার আকার সুন্দর হয়। প্রায় ৩ মাস বয়স পর্যন্ত শিশু চিৎ হয়ে ঘুমায়। ৪ মাস বয়সের মধ্যে শিশুর উপুর হতে পারে এবং বিভিন্ন অবস্থানে ঘুমাতে পারে। একই অবস্থানে বেশিক্ষণ ঘুমানো শিশুর জন্য আরামদায়ক হয় না। ৬ মাস বয়সের শিশু নিজেই ঘুমের অবস্থান ঠিক করে নেয়। অনেক শিশু উপুর হয়ে ঘুমাতে পছন্দ করে এতে শরীরের ক্লান্তি দূর হয়, ফুসফুসের কার্যক্রমের সুবিধা হয়, শান্তিপূর্ণ এবং গভীর ঘুম হয়।

শিশুর ঘুমের পরিবেশ

শিশু যদি চাহিদা মতো খাবার খায়, আরাম ও কোলাহলমুক্ত পরিবেশ পায় তাহলে শিশুর ঘুম ভালো হয়।শিশুর ঘুমের স্থান হবে কোলাহলমুক্ত, নিরাপদ, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও শান্ত পরিবেশ। শিশুর বিছানা হবে নরম এবং আরামদায়ক। শিশুর দুইপাশে কোল বালিশ দিয়ে চেপে দিলে শিশু নিজেকে নিরাপদ মনে করে। অনেক সময় ঘুমের মধ্যে প্রস্রাব করে দিলে শিশু আড়মোড়া দিয়ে জেগে উঠে। যথাসম্ভব শিশুর ঘুম না ভেঙে কাঁথা কাপড় বদলে দিতে হবে। মশামাছির উপদ্রব থাকলে ছোট মশারি দিনের বেলায়ও টানানো যায়। শিশুর পরিচিত বিছানা না হলে ঘুমের ব্যাঘাত হয়।

ব্যায়াম

শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ ও মাংসপেশিগুলোর মধ্যে সমন্বয় আনয়নের জন্য যে ধরনের অঙ্গ সঞ্চালনের প্রয়োজন হয় তাকে ব্যায়াম বলে।

শিশুর শারীরিক বিকাশ ও সুন্দর দেহ গঠনের জন্য ব্যায়াম অত্যন্ত জরুরি। ব্যায়াম করালে দেহের স্নায়ুগুলো সবল ও পুষ্ট হয় এবং কাজ করার ক্ষমতা বাড়ে।

ছোট শিশু অনবরত হাত-পা ছোড়ে। মাথা ঘুরায়, আঙুল নাড়ে এতে স্বাভাবিক ভাবেই শরীরের পেশির ব্যায়াম হয় কিন্তু শরীরের সব অঙ্গের ব্যায়াম হয় না। শরীরের কিছু কিছু পেশি আছে যেগুলো নিজে নিজে সঞ্চালিত হয় না, সেজন্য মায়ের সাহায্যের প্রয়োজন।

যতক্ষণ শিশু উপুর না হয় ততক্ষণ ধড়ের পেশির উৎকৃষ্ট ব্যায়াম হয় না। ৩/৪ মাসের সময় যখন শিশু কাৎ হয়, গড়াগড়ি করে তখন ভালো ব্যায়াম হয়। শিশু বসতে বা দাঁড়াতে না পারলে শিশুর নিম্নাঙ্গের পেশি, পায়ের গোড়ালি ও পাতার ব্যায়াম হয় না।

বয়স বাড়ার সাথে সাথে শিশু বহিরাঙ্গনে খেলায় মেতে উঠে যেমন দৌঁড়াদৌড়ি করা, বল খেলা, সাইকেল চালানো, মই বেয়ে উপরে উঠা ইত্যাদি। তখন ব্যায়ামের প্রয়োজন হয় না। আড়াই বছরের পর শিশু যখন নার্সারিতে যায় সেখানে বহিরাঙ্গনে খেলার ব্যবস্থা থাকে।

শিশুর ব্যায়ামের নিয়ামাবলী

একমাস বয়সের পর থেকে শিশুকে ব্যায়াম করানো উচিত। তিন মাস পর্যন্ত চিৎ হয়ে শুয়ে থেকে বিরক্তি বোধ করে। প্রথমদিকে শিশুর ব্যায়ামের সময়সীমা ১০-১৫ মিনিট এবং আস্তে আস্তে যতক্ষণ না পর্যন্ত শিশু ক্লান্ত হয় এই সমায়সীমা ৩০ মিনিট থেকে ১ ঘন্টা করা যায়।

শিশুর বিছানাতেই শিশুকে ব্যায়াম করাতে হবে। ব্যায়াম করানোর আগে শরীরে তেল মালিশ করতে থাকলে শিশু উৎফুল্ল থাকে। দুই মাসের শিশুকে অনেক সময়ে বগলে হাত দিয়ে দাঁড় করালে হাত-পা ছুড়ে নাচার ভঙ্গিমা করে এতেও পেশি সক্রিয় হয়।

- শিশু যখন চিৎ হয়ে শুয়ে থাকে তখন শিশুকে আপনার হাতটি ধরতে দিন, আস্তে আস্তে শিশুকে বসার অবস্থানে নিয়ে আসুন এবং পরে আবার আগের অবস্থানে নিয়ে যান। শিশু ক্লান্ত না হওয়া পর্যন্ত কয়েকবার করুন। এতে শিশুর পেছনের পেশি, হাতের বাহু এবং আঙ্গুলের ব্যায়াম হয়।
- শিশুর হাত দুটো শক্ত করে ধরে প্রথমে ডান পাশে এবং পরে বাম পাশে করুন এতে বসার জন্য যেসব পেশি থাকে সেগুলোর ব্যায়াম হয়।
- শিশুর দুই পা এবং হাত কোনাকুনিভাবে টানলে পায়ের গোড়ালীর পেশি সঞ্চালিত হয়।
- ডান পা তুলে বাম দিকে এবং বাম পা তুলে ডান দিকে টেনে দিলেও পায়ের পেশির ব্যায়াম হয়।
- শিশু যখন উপুর হয় তখন পেটে চাপ পরে, শিশু হাতের তালু এবং বাহুর উপর ভর করে মাথা ও ঘাঁড় উঁচু করে তোলে এতে শিশুর ধড় ও পেছনের পেশি সুবিন্যস্ত হয়, বাহুর শক্তি বৃদ্ধি পায়, ঘাঁড় তাড়াতাড়ি শক্ত হয়।
- শিশু চিৎ হয়ে শুয়ে মায়ের পেটে অনবরত লাথি মারে, এতে শিশুর হাঁটুর পেশি শক্ত ও সবল হয়।
- শিশুর হাতে নরম খেলনা তুলে দিলে শিশু শব্দ করে ধরবে এতে শিশুর আঙুলের শক্তি বাড়বে।

যতদিন না পর্যন্ত শিশু হাঁটতে পারে, দৌড়াতে পারে, খেলাধুলা করতে পারে ততদিন পর্যন্ত এ ধরনের ব্যায়াম চালিয়ে যেতে হবে।

সূর্যালোক

সূর্য মানুষের প্রাণশক্তির উৎস। সূর্যালোক শিশুর স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিশুর সুস্বাস্থ্যের জন্য প্রয়োজন পর্যাপ্ত সূর্যালোক ও মুক্ত বায়ুর ব্যবস্থা করা। শিশুর কক্ষে সূর্যালোক ও মুক্ত বায়ু প্রবেশের ব্যবস্থা থাকতে হবে। স্যাঁতসেঁতে কক্ষে শিশুর ঠান্ডা লাগার সম্ভাবনা থাকে।

শিশু যখন হাঁটতে শেখে তখন সকালে ও বিকালের রোদে হাতে ধরে ঘরের বাইরে এনে হাঁটাচলা করানো যায়। শিশু যখন দৌড়াদৌড়ি করতে শেখে তখন শিশু নিজেই ঘরের বাইরে এসে সূর্যালোক পায়। সকালের ঠান্ডা রোদে কিছুক্ষণের জন্য দৌড়াদৌড়ি বা ঘোরাফেরা করলে, মুক্ত বায়ু সেবন করলে শিশুর স্বাস্থ্য ভালো থাকবে।

সূর্যালোক থেকে শিশুর দেহের ত্বকের নিচে ভিটামিন 'ডি' তৈরি হয় এতে শিশুর দেহের হাড় মুজবুত হয়। অস্থি বিকৃতির রোগ 'রিকেট' হলো ভিটামিন 'ডি' এর অভাবজনিত রোগ। শিশু তা থেকে রক্ষা পায়। সূর্যালোক দেহের সাধারণ রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সহায়তা করে। শিশুর দেহে ঠান্ডা লাগার ভয় থাকে না। সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়।

শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার ২/৩ দিন পর প্রথমে ২/৩ মিনিট করে রোদে রাখা যায়। আস্তে আস্তে সময় বাড়িয়ে দিতে হবে।

সূর্যালোকে রাখার সময় খেয়াল রাখতে হবে যাতে সূর্যের দিকে শিশু না তাকায় এতে চোখ খারাপ হতে পারে। সেজন্য শিশুর মাথা ও চোখে রোদ না পড়াই ভালো। শিশুকে এক নাগাড়ে রোদে না রেখে কিছুক্ষণের জন্য সরিয়ে এনে আবার রোদে আনা যায়। এভাবে শিশুর প্রয়োজনীয় সূর্যালোক শিশু পেয়ে যায়।

সারাংশ

ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরপরই শিশু স্বাবলম্বী হয়ে ওঠে না, নিজের প্রয়োজনগুলো মেটাতে পারে না। মায়ের দায়িত্ব হলো শিশুর প্রয়োজনগুলো কী এবং কী ভাবে সেগুলো মেটানো যায় তা দেখা। যেমন, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য শিশুকে গোসল করানো, শিশুর শরীর সুস্থ রাখার জন্য ঘুম পাড়ানো, শরীরের সর্বাঙ্গের সঞ্চালনের জন্য ব্যায়াম করানো এবং শিশুর স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য সূর্যালোকের ব্যবস্থা করা।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ৬.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন।

১. শিশুর পোশাক কেমন হওয়া উচিত?
(ক) সুন্দর ও চকচকে (খ) নাইলন ও সিনথেটিক কাপড়ের
(গ) নরম, পাতলা ও ডিজাইন বর্জিত

২. গোসলের প্রয়োজনীয়তা কী?
(ক) তাপ ও গরম থেকে আরাম দেয়া (খ) পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হওয়া
(গ) গোসল উপভোগ করা

৩. এক বছরের শিশু কতক্ষণ ঘুমায়?
(ক) ১০ ঘন্টা (খ) ১২ ঘন্টা
(গ) ১৪ ঘন্টা

৪. কত বছর বয়সে শিশুকে ব্যায়াম করাতে হয়?
(ক) ১ বছর থেকে ২ বছর (খ) জন্মের পর থেকে ১ বছর
(গ) ২ বছর থেকে ৩ বছর

৫. শিশুর জন্য সূর্যালোকের প্রয়োজন হয় কেন?
(ক) শীতকালে আরাম দেয়ার জন্য (খ) স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য
(গ) অন্ধকারকে ভয় পায় বলে

সঠিক উত্তর মিলিয়ে নিন

১. শিশুরা পোশাকের ডিজাইনের চেয়ে	ক. মানসিক ভাবে প্রস্তুত করে নিতে হবে
২. শিশু গোসল করতে ভয় পেলে	খ. ঘুমের প্রয়োজন
৩. শরীরের তাপের ক্ষয়পূরণের জন্য	গ. ব্যায়ামের দরকার
৪. সূর্যালোক শিশুর ত্বকের নিচে	ঘ. রং এর প্রতি আকৃষ্ট হয় বেশি
৫. শিশুর অঙ্গ সঞ্চালনের জন্য	ঙ. ভিটামিন 'ডি' তৈরি করে

রচনামূলক প্রশ্ন

১. পোশাকের প্রয়োজনীয়তা কী? পোশাক নির্বাচনের বিবেচ্য বিষয়গুলোর ব্যাখ্যা দিন।
২. শিশুর গোসলের গুরুত্ব ও গোসল করানোর নিয়ম বর্ণনা করুন।
৩. শিশুর জন্য ঘুম, ব্যায়াম ও সূর্যালোকের প্রয়োজনীয়তা আলোচনা করুন।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. শিশুর পোশাকের ডিজাইন কেমন হওয়া উচিত?
২. শিশুর গোসলের প্রস্তুতি কিভাবে নিতে হয়?
৩. বিভিন্ন বয়সে শিশুর ঘুমের রূপ কেমন হয়?
৪. শিশুকে ব্যায়াম করানোর নিয়মাবলি কী?
৫. কিভাবে শিশুকে সূর্যস্নান করানো হয়?

উত্তরমালা ঃ ১। গ ২। খ ৩। ক ৪। গ ৫। খ
সঠিক উত্তর মিল করুন ১। ঘ ২। ক ৩। খ ৪। ঙ ৫। গ